ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1117-1123
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.329

ঋত্বিক ঘটকের নাটক ‘জ্বলন্ত’: সামাজিক অবক্ষয়ের মর্মস্পর্শী ছবি

সৌমিক মুখার্জী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract
‘Jwalanta’ is the final play written by Ritwik Kumar Ghatak. The central theme of this drama revolves around a teenage girl from a destitute family who falls victim to the miscreants of society and is raped. Subsequently, she is murdered by being set on fire. The play vividly depicts various anti-social activities—including the smuggling of stolen goods, the looting of railway wagons, and the brutalization of women. The central protagonist of the play is Bishnupriya, while the characters involved in these illicit activities are Raja, Rana, and Feku. Through this work, the playwright endeavors to expose the moral decay plaguing society. He illustrates how women have been subjected to oppression across different historical eras; in this context, he invokes the stories of Sita, Draupadi, and Shakuntala through the medium of song. The playwright highlights the inherent conflict between ancient Indian civilization and modern urban society. He refrains from situating the play within any specific historical timeframe; rather, his primary objective is to underscore the existential crisis confronting society. The erosion of human values takes center stage in this drama. He demonstrates that such anarchy was rampant throughout the entirety of Bengal, leaving the ordinary, destitute masses with no means of escape or survival—they inevitably fall victim to this relentless oppression. At the play's conclusion, following Bishnupriya's death, the playwright addresses the audience directly, asserting that the people must rise in revolt. Only through a collective uprising can a remedy to this situation be found. United public resistance remains the sole solution to this crisis; otherwise, society will plunge even deeper into darkness, and beasts like Raja, Rana, and Feku will continue to snuff out the vibrant young lives of countless girls like Bishnupriya.

Keywords: Ritwik Kumar Ghatak, Playwriter, Social crisis, ancient Indian civilization, oppression, collective uprising

ঋত্বিক ঘটকের সাহিত্যকর্ম হোক কিংবা চলচ্চিত্র নির্মাণ— সবক্ষেত্রেই এক তীব্র তাড়ণা আমরা দেখতে পাই। এক ধরণের অস্বস্তি তাঁর মধ্যে সবসময় কাজ করে গেছে। সেই অস্বস্তির মূলে ছিল দেশভাগ। দুই বাংলার মধ্যে কাঁটাতারের বিভাজনকে তিনি কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি। দেশভাগের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সমাজকে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করে গিয়েছে। এই সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার হয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের প্রতিবাদ চালিয়ে গিয়েছেন। সেই প্রতিবাদের ফলস্বরূপ হলো ‘জ্বলন্ত’ নাটক। তিনি মৃত্যুর ঠিক এক বছর পূর্বে ১৯৭৫ সালে এই নাটকটি রচনা করেছেন। তাঁরই নির্দেশনায়

এবং সঙ্গীত পরিচালনায় ওই বছর ২৪ অগাস্ট নাটকটি অভিনীত হয় আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে। নাটকটি লেখার আগে তিনি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছে 'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে একটি প্রস্তাবিত ছবির সংক্ষিপ্তসার জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো উত্তর না পাওয়ায় সেই কাহিনিকে নাট্যরূপ প্রদান করে রচনা করেন 'জ্বলন্ত' নাটক। এই নাটকের প্রসঙ্গে সংহিতা ঘটক যিনি ঋত্বিক ঘটকের কন্যা এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি নাটকটিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি এক স্মৃতিচারণায় বলেন,

> "১৯৭৪ সালে ঋত্বিক ঘটক একটি নাটক লিখেছিলেন 'জ্বলন্ত'— একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। পশ্চিমবঙ্গে তখন বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। খবরের কাগজে সব সত্য ঘটনা ছাপা হয় না। এই খবরটিও অন্যভাবে বেরিয়েছিল। উনি নিজের উদ্যোগে আসল ঘটনা জেনে লিখেছিলেন এই নাটক।"[১]

এই নাটকে সামাজিক অবক্ষয়ের যে ছবি ফুটে উঠেছে সেদিকে আলোকপাত করার পূর্বে নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে নেওয়া আমাদের দরকার।

এক

দেশভাগের নিদারুণ ফলাফলের দরুণ পূর্ববাংলা থেকে এক ছিন্নমূল পরিবার— এক প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, যিনি প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ এবং শাস্ত্র সম্পর্কে বিদগ্ধ তিনি অসহায় অবস্থায় তাঁর পরিবারকে নিয়ে উপস্থিত হন। এই নাটকে একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা অন্যদিকে নবনির্মিত সভ্যতা। এই নবনির্মিত সভ্যতার যূপকাষ্ঠে পড়ে ধর্ষিতা হয় বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রটি। ধর্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আগুনে নিক্ষেপ করার মধ্য দিয়েই ঋত্বিক ঘটক দেখাতে চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধংসের ছবি। এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সমাজ, বিপন্ন সভ্যতা এবং মানুষের মূল্যবোধের সংকট।

নাটকে চরিত্র সংখ্যা চোদ্দ। তারাচরণ, শচীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, সুশোভন, দুর্গাচরণ, ন্যায়রত্ন, রঘুদেব সার্বভৌম, উৎপল, বিদ্যাভূষণ, কণিকা, রাজা, রাণা, ফেকু, দারোগা, রাইচরণ, সেপাই এবং পুলিশের বড়কর্তা। পুলিশের বড়কর্তা চরিত্রটির নাটকে কোনো শারীরিক উপস্থিতি নেই। যে মূল্যবোধের সংকট নাটকের মূল বিষয় তার সূচনা আমরা প্রথম দৃশ্য থেকেই দেখতে পাই। পরবর্তীতে নাট্যকার এই সংকটের ছবিকে আরো দৃঢ়তর করেছেন। নাটকের শুরুতে দেখা যায় নাট্যকার উল্লেখ করছেন,

> "যবনিকা যখন উঠছে পেছনে থাকবে কালো পর্দা। হঠাৎ কতগুলো আলো জ্বলে উঠবে। ওপরের থেকে নেমে আসবে একটি পোস্টার। তাতে লেখা: নাটক ভাঙাই এই নাটকের কাজ।"[২]

নাট্যকার নাট্য নির্দেশনার মধ্যে দিয়ে দর্শকের যেন ধাক্কা মারতে চেষ্টা করেন। কালো পর্দা দিয়ে সমাজের মধ্যেকার কালো, অন্ধকারময় পরিস্থিতিকে যেন দেখাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে তীব্র আলোর মাধ্যমে দর্শকের চোখের আরাম ভঙ্গ করতে চেয়েছেন। 'নাটক ভাঙাই এই নাটকের কাজ' এর মধ্যে দিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছেন যে প্রচলিত নাট্যগুণ সম্পন্ন এই নাটক নয়। এখানে দর্শকদের বিচার, বিবেচনায় বারংবার আঘাত করা হবে। আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, নাটকের শুরুতে গানের উল্লেখ রয়েছে। ঋত্বিক ঘটক দর্শকদের বোধকে নাড়া দেওয়ার জন্যই গানটি উপস্থাপন করেন। "শচীমাতা গো, আমি চারযুগে হই জনমদুখিনী।/ সত্যযুগে ছিলাম সীতা, ত্রেতাতে দ্রৌপদী/ দ্বাপরে ছিলাম শকুন্তলা, কলিতে এই বিষ্ণুপ্রিয়া।/ মাগো আমি চারযুগে হই জনমদুখিনী।"[৩] অর্থাৎ চারযুগে (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি) চার নারীর আত্ম-যন্ত্রণার কথা কবুল করে কলির বিষ্ণুপ্রিয়াকে হাজির করতে চান বিশ শতকের সত্তরের দশকে। এরপর দেখা যায় নাটকের প্রথম দৃশ্যে দারোগা রাইচরণ আসলে একজন ভণ্ড ব্যক্তি। সে আই.জি-এর ভাইপো সেজে রাজা-রাণা-ফেকুর মতো মানুষদের

অসামাজিক কাজে মদত দিতে থাকে। তারাচরণ এবং সুশোভনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেন নাট্যকার তৎকালীন সামাজিক অবক্ষয়ের ছবিটি।

> "তারাচরণ: বাংলাদেশে মারাত্মক চোরাচালান, রাহাজানি, ছিনতাই। সব থেকে বড়ো সমস্যা নারী। এই নারীদের সম্ভ্রমের কোনো মূল্যই নেই তাদের কাছে। আমার মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া—শুধু আমারটা কেন, সকল মেয়েরই এক অবস্থা।"[৪]

দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা পরিচিত হই রাইচরণ এবং রাজা-ফেকু-রাণার কাজের সঙ্গে। রাতের অন্ধকারে মালগাড়ি থেকে মাল নামায় রাজার দল। BSF এবং CRP-এর লোকদের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধলে দারোগা রাইচরণ মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসে। BSF এবং CRP-এর লোকেরা টাকার ভাগ পেয়ে মনের আনন্দে সেখান থেকে প্রস্থান করে। রাজাদের দল পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে আসা মালের ডেলিভারি নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাজার দল শুধু ওয়াগন ব্রেকিং, চোরাচালান বা মালপাচার করেই ক্ষান্ত হয় না। রঘুদেব সার্বভৌমের মেয়ে সুষমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এই কাজের পরোক্ষ মদত থাকে রাইচরণের। তারা রঘুদেবকে শাসায় এই বলে, "রাজা- এক নম্বর, গাঁ ছাড়বেন না। ছাড়বার চেষ্টাটি করলে আপনার হালত টাইট হওয়ার সম্ভাবনা।..."[৫]

তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় তাদের নজর পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ওপর। কিন্তু তারাচরণের আকস্মিক আগমনে বিষ্ণুপ্রিয়া সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। শেষদৃশ্যে পৌঁছে নাটককার একের পর এক অনেকগুলি ঘটনা হাজির করেছেন। মঞ্চে চরিত্রগুলি ক্রমানুসারে প্রবেশ করেছে। প্রথমেই দেখা যায় রাজা-রাণা-ফেকুকে, যারা তাদের মাল পাচারের কাজ নিয়ে মত্ত। এরপর মঞ্চে প্রবেশ করে কণিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়া। এই দুই কিশোরী নিজেদের কিশোর প্রেম নিয়ে ব্যস্ত। তারপর দুর্গাচরণ, রঘুদেব, উৎপল আসে। তারাও নিজেদের আলোচনায় মত্ত থাকে। শেষে দেখা যায় বিষ্ণুপ্রিয়া রাজাদের দলের হাতে ধরা পড়ে। রাজাদের দল বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা পালিয়ে যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় সুশোভন বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথা কোলের ওপর নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে প্রশ্ন করছে,

> "আর কতদিন, আর কতকাল দেশের মানুষ এইসব সহ্য করবে? এ আর সয় না। আপনারা যাঁরা নাটক দেখতে এসেছেন, বাড়ি গিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়বেন, কাল আবার অফিসকাছারি করবেন। কিন্তু এ অত্যাচার চলতেই থাকবে। এর কি কোনো রাস্তা নেই? দুর্নীতি দমন করার কি কোনো পথ নেই? আপনারা ভাবুন।"[৬]

নাটককার সমকালীন সমাজব্যবস্থার নগ্নরূপকে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। নিজের দেশের মধ্যেকার মানুষদের মধ্যে এরকম মনোবৃত্তি পাঠকমনকে নিঃসন্দেহে বিস্মিত করে। নাটকে দেখা যায় সুষমা নামক এক চরিত্র সে রাজা-রাণা-ফেকুদের অত্যচারে উন্মাদ হয়ে যায়। এই ঘটনাটি শচীদেবীকে প্রতিবাদী করে তোলে। কিন্তু সেও নিজের মেয়েকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি।

দুই

'জ্বলন্ত' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্যকারের দুটি বক্তব্যকে আমরা উপস্থাপন করবো।

এক, তিনি বলেছেন,

> "ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে বারবার বিষ্ণুপ্রিয়া invaded হয়েছে। বাইরের বিভিন্ন রাজশক্তির আক্রমণে ভারত-মা ধর্ষিতা। বিষ্ণুপ্রিয়া আমার সেই সামান্য মেয়ে যে represent করেছে সেই ভারতবর্ষকে।"[৭]

দুই,

> “‘জ্বলন্ত’ নাটকের সমাজবিরোধী প্রসঙ্গে একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন তিনি তিনমূর্তিকে নাটকে আনলেন? দুই বা চার নয় কেন? তিনি বলেছিলেন, “দিল্লিতে যে তিনমূর্তি... যে ছাপ (লাগানো আছে সেটা বুঝতে পারছ না, সত্যমেব জয়তে?”[৮]

নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিণতি আমাদের সমাজে নতুন কোনো ছবি নয়। যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে নারীরা অবহেলিত, নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। নারীর যন্ত্রণা দিয়েই শুরু করেছেন নাটকের। পরবর্তীতে দেখিয়েছেন সামাজিক দুর্নীতির ছবি। রাজা, রাণা, ফেকুরা রেলের ওয়াগান ভাঙার মতো অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছে। টাকা রোজগারই তাদের মূল উদ্দেশ্য। আসলে নাট্যকার যে সময়ে রচনা করেছেন নাটকটি সেই সময় অর্থাৎ সত্তরের দশক ছিল টালমাটাল সময়ের। বাংলার বুকে তখন নকশাল আন্দোলন চলছে। সরকারি আদেশের অজুহাতে প্রশাসন প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে যুবকদের। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সমাজে তখন ঠিক ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীতে দেশে বেকারত্ব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি কালোবাজারির উদ্ভব হয়। রাজা, রাণা, ফেকুরা আসলে সেই সমাজব্যবস্থারই ফল। তাদের মধ্যে কেবল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে নিজের মানবিক মূল্যবোধের বিসর্জন দিতেও পেছপা হয় না। সেই কারণেই জীবন নষ্ট করেছে তারা সুষমার, বিষ্ণুপ্রিয়ার। নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে তারা ব্যবহার করেছে।

নাটকে আরেক শ্রেণির মানুষদের দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন, রঘুদেব সার্বভৌম এবং উৎপল বিদ্যাভূষণ। এরা যেন বাংলার প্রচলিত প্রবাদ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সার্থক উদাহরণ। নিজের চারপাশের পরিস্থিতি না দেখে বাইরের দেশে কী হচ্ছে সেই নিয়ে বেশি আগ্রহী। নিজদের আশেপাশে যে সামাজিক অবক্ষয় সেটা নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। বিশ্ব রাজনীতিতে কী চলছে সেটা নিয়ে ভাবতে তারা আগ্রহী।

> “দুর্গাচরণ: ভিয়েতনাম মিটেও মিটছে না দাদু, মার্কিনি ঠান্ডা চাঁদ, কোথায় আচো? কামবোডিয়ায় লন নলের কী হাল হবে ভেবে দেকেচো? কী হে রঘুদেব সার্বভৌম, কী বৎস উৎপল বিদ্যাভূষণ, কিছু বলবে তো?”[৯]

দেখা যাচ্ছে এরা ভিয়েতনাম, আমেরিকা নিয়ে বেশি চিন্তিত। পরবর্তীতে নাটকে দেখা যায় সুষমা যে রঘুদেব সার্বভৌমের কন্যা সে ধর্ষিতা এবং উন্মাদ হয়ে যাওয়ার পরেও রঘুদেবের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। সে একইভাবে বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বরাজনীতি নিয়ে আলোচনায় মত্ত থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় রাজা রেল ওয়াগান থেকে মাল চুরির পাশাপাশি টিকিট ব্ল্যাক করবার মতো কাজের সঙ্গেও লিপ্ত রয়েছে—

> “রাজা: টিকিট বেলাকের ব্যবস্থা আগের মতো করে রাখবি, ভুলবিনে যেন। এ মোকায় সাতের টিকিট সত্তরে না ঝেড়েছি তো আমার নামে কুকুর পুষিস।”[১০]

‘জ্বলন্ত’ নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন দেশমাতার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিণতি যেন দেশমাতার অপমৃত্যু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নাটককার তাঁর নাটকের ঘটনার কোনো সময় নির্দেশ করেননি। পূর্ববাংলা থেকে আগত একটি পরিবারের জীবনে দেশভাগ যে দুর্দশা ঘনিয়ে তুলেছে সে ঘটনাই নাটককার তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন। দেশভাগ সে ভারতবর্ষ হোক, জার্মানি হোক বা অন্য দেশ, তার প্রতিক্রিয়া যে সর্বত্র সমান নাটককারের এই বিশ্বাসই হয়তো-বা এখানে প্রতিফলিত। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং নগর সভ্যতার অমানবিক আস্ফালন— এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব এই নাটকে উঠে এসেছে। নগর সভ্যতার বলি হয়েছে সুষমা, বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো নারীরা। তারা যুগে যুগে এভাবেই লাঞ্ছিত হয়েছে। আর ধর্ষকদের মধ্যে দিয়ে সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে দেখাতে চেয়েছেন। তাদের

জন্যই সমাজে অবক্ষয় নেমে আসে। তারা শোষণ করে নারীদের। তাদের হাতে পড়েই প্রাণ হারায় অসহায় নারীরা। তারা এভাবেই কালিমালিপ্ত করে দেশমাতাকে। রাজা, রাণা, ফেকু এই তিন চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাটককার তাঁর সমকালীন ক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন। তিনি তুলে ধরেছেন অ-সামাজিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে। সামাজিক অনাচার তাদের বিচলিত করে না, কিন্তু সে অনাচার এক সাধারণ বাঙালি মাকে ক্ষোভে বিদ্রোহী করে তোলে। দুষ্টের দমনকারী প্রশাসকের ভক্ষকরূপ উঠে এসেছে নাটকের মধ্যে।

এই নাটকে আর একটি প্রায়োগিক দিকের কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক। সামাজিক দুর্দশার ছবি তুলে ধরতে গিয়ে নাটককার এক অভিনব প্রয়োগ কৌশল ব্যবহার করেছেন। সেটি সবুজ মাকড়সার মৃত্যুর নৃত্য বা গ্রিন ট্যারানটুলা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পুরুষ মাকড়সাকে স্ত্রী মাকড়সারা সম্ভোগ করে। তারপর তাকে ঘিরে স্ত্রী মাকড়সাগুলোর নৃত্য শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পুরুষ মাকড়সাকে তারা খেয়ে ফেলে। নাটকে রাইচরণ-দারোগার কাছ থেকে সব রকম সুবিধা আদায় করেছিল রাজার দল। শেষদৃশ্যে দারোগাকে ঘিরে তারা নাচতে থাকে, যেন খেতে আসে। ওদের নাচের ছন্দে দারোগাও নাচতে বাধ্য হয়।

সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যেই খুব স্পষ্ট। এমন একটা সময়কে দেখিয়েছেন নাট্যকার যেখানে মানবিক মূল্যবোধ যেমন হারিয়ে গেছে তেমনি অসামাজিক কার্যকলাপ তার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। যাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে তারা শাসন করছে ক্ষমতাহীনদের ওপর। আর সব চাইতে বড় কথা ক্ষমতাহীনদের পালিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। কারণ সমগ্র দেশ জুড়েই এইরূপ অবস্থা। তাই নাটকের শুরুতে তারাচরণের সংলাপের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট করে দিয়েছেন নাটককার। তারাচরণদের কোথাও পালিয়ে যাবার জায়গা নেই। তারা চরম অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেও থেকে যায় তাদের ভিটে মাটি আঁকড়ে। এই চরম সংকট শুধু তারাচরণের নয়। তার মতো হাজার হাজার পরিবারের। স্বাধীনতার বেশ কিছু বছর কেটে যাওয়ার পরেও পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন হয়নি। এমনকি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই নারীদের ওপর অত্যাচারের কথা। প্রাচীন যুগে যা অবস্থা ছিল বর্তমানে একই আছে। নাটকের শেষে তাই ঋত্বিক ঘটক ফ্লাই কার্ডের মাধ্যমে দেখিয়েছেন,

> "মানুষকে বাঁচতে হলে খেপতে হবে। খ্যাপো ভাইবোনেরা, সব খ্যাপো। খেপে তুলকালাম করো। নইলে কিছুটি হবার নয়।"[১১]

সামাজিক অবক্ষয়ের থেকে মুক্তির উপায় একটাই। সবাইকে একত্রিত হয়ে লড়াই করতে হবে। ওই গ্রামে যদি সুষমার ওপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করতো কেউ তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে মরতে হত না। কিন্তু সবাই চুপ করেছিল। সেটা রাজাদের ভয়েই হোক কিংবা তাদের অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া জীবনের জন্যেই হোক। নাটককার এখানেই আঘাত হানতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে খেপে উঠতে, অস্থির হয়ে উঠতে। তবেই প্রতিবাদের ঢেউ উঠবে। জঙ্গলের যে আইনের কথা নাটকে বলা হয়েছে সেটার বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদের স্বর জাগাতে চেয়েছেন নাটককার।

ঋত্বিক ঘটক তাঁর নাটক 'জ্বলন্ত'-তে প্রাচীন সভ্যতার অবক্ষয়ের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়ের দিকটির মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেছেন। তিনি নাটকের সূচনাতেই যে গানের অবতাড়না করেছেন তার মধ্যে দিয়েই নিজের ভাবনাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেখানে সীতা, দ্রৌপদী, শকুন্তলার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন। সীতাকে সতীত্ব পরীক্ষার জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অন্যদিকে দ্রৌপদীর ভরা রাজসভায় বস্ত্রহরণ হয়েছিল। শকুন্তলাকে তাঁর জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। পরবর্তীতে এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিষ্ণুপ্রিয়াকেও একইভাবে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। এই নারীদের মধ্যে আপাত সময়ের পার্থক্য থাকলেও তাদের অবস্থানের কোনো পার্থক্য ছিল না। তারা সকলেই

নিপীড়িত। নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রের নামকরণের মধ্যে দিয়ে নাটককার যেন তাঁর নিয়তি রচনা করে দিয়েছিলেন। তাই নাটকে আমরা দেখি তাকে ধর্ষণ করছে রাজাদের দল। পরবর্তীতে তাকে হত্যা করে রাজাদের দল। এও যেন এক আধুনিকা সীতা, যার শেষ পরিণতি আগুনের লেলিহান শিখায়। আসলে নাটকের মূল বক্তব্য এটাই, যতদিন এই অরাজকতা থাকবে তার বলি হবে সমাজের অসহায় নারীরা। শুধু নারী বলেই নয় যারা সমাজের নীচু তলার মানুষ, সহায় সম্বলহীন তারাও একইভাবে নির্যাতিত হবে। শত আপমান, বঞ্চনা সহ্য করেও তাদের থেকে যেতে হবে নিজের ভিটে মাটি আঁকড়ে। এ এক অন্য ধরণের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম।

ঋত্বিক ঘটক মূলত চলচ্চিত্রকার হলেও তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। মানুষই তাঁর রচনার প্রথম ও শেষ কথা। তাই সাহিত্যের সংরূপ পরিবর্তন করে তিনি কখনও গল্পে আবার কখনও নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হননি। এই নাটকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই মানুষের কথা। তাদের দুঃখ, দুর্দশার কথা প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কাছে মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হয়নি, তাঁর কাছে বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এই নাটক শেষে তাই ইতিবাচক সমাধান দর্শকদের দেখিয়েছেন। বলেছেন খেপে উঠতে। এই খেপে ওঠা আসলে প্রতিবাদ। জীবন অতিবাহিত করার দুটো উপায় থাকে। এক, যা হচ্ছে সেটা হতে দিতে হবে। চুপচাপ মেনে নিতে হবে। আর দুই, সেটাকে দায়িত্ব নিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। ঋত্বিক ঘটক সেই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের মধ্যে পড়ে। তাই তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নিছক প্রেমের কিংবা সামাজিক ঘরোয়া নাটক তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হয়নি। তিনি নিজেকে নিমজ্জিত করেছেন প্রতিবাদের আবর্তে। সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র ক্ষোভ নাটকে প্রতিফলিতে হয়েছে। সমাজের কোনো সুষম প্রতিচিত্র রচনার প্রয়াস নয়, সামাজিক সমস্যা ও তার থেকে উত্তরণের প্রয়াস নাটকের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। খবরের কাগজের একটি ছোট সংবাদ থেকে তিনি কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেটিকে বৃহৎ এক পরিসরে স্থান দিয়েছেন তিনি। সেখান থেকে সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন তিনি। শুধুই অবক্ষয়ের দিকটি দেখানো তাঁর লক্ষ্য ছিল না। সেদিক থেকে তিনি একজন সার্থক শিল্পী। ঋত্বিক ঘটক ব্যক্তিজীবনে গণনাট্যের সদস্য ছিলেন। তিনি বিজন ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য গণনাট্যের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করেছেন। তাই তিনি গণনাট্যের যে মূল বৈশিষ্ট্য শুধু সমস্যা দেখানো নয়, সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ স্পষ্ট করে দেওয়া, সেটাও নাটকের মধ্যে দেখা যায়। তিনি সবাইকে খেপে উঠতে বলেছেন। একত্রিত হতে বলেছেন। এই সমাধানসূত্র প্রসঙ্গ তাঁর নাট্যকৃতীকে দর্শায়। ঋত্বিক ঘটক একজন মানূষের শিল্পী। তাই শিল্পের জন্য শিল্প করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মানুষের জন্য শিল্প করতে চেয়েছেন। তাঁর 'জ্বালা' থেকে 'জ্বলন্ত' সব নাটকেই এই কথাই উচ্চারিত হয়েছে। 'জ্বলন্ত' নাটক হয়তো নাট্যগুণ সম্পন্ন বিখ্যাত নাটক হিসাবে পরিচিত হতে পারেনি। কিন্তু এই নাটক যে নাটক ভাঙার নাটক সেটা ঋত্বিক ঘটক বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে ব্রেশট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেটার বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের আলোচনার মূলে ছিল এই নাটকের মধ্যে দিয়ে কীভাবে তিনি সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটি তুলে ধরতে পেরেছেন। আমরা আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম তিনি সেই দিক থেকে সার্থকতা লাভ করেছেন। এই নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিলেই দেখা যায় যে অরাজকতাকে বিষয় করেই তিনি রচনা করেছেন নাটকটি। সেখানে মানুষদের দুঃখ, কষ্টের কথাই প্রধানত উঠে এসেছে। চোরাকারবারি, ঘুষখোর, ধর্ষক ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ কীভাবে সমাজে পচন ধরিয়ে দিয়ে সুস্থ সুন্দর পৃথিবীকে নষ্ট করে দিচ্ছে সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকের এক সংলাপে বলে, "... আকাশ কী সুন্দর! মাঠ নদী কী সুন্দর! মানুষ কী সুন্দর! সব সুন্দর, না মা!"[১২] নিষ্পাপ এই কিশোরী যে সবকিছু সুন্দর দেখছিল তাকেই বেছে নিতে হল আত্মহত্যার পথ। এই সুন্দর পৃথিবী থেকে তাকে চলে যেতে হয়। এই ক্ষোভটাই নাটকের মেরুদণ্ড। ঋত্বিক ঘটক এভাবেই স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন সমগ্র নাটক জুড়ে।

তথ্যসূত্র:

১. চ্যাটার্জী, কুমার সৌমিত্র সম্পাদনা। নাট্যকথা বিশেষ সংখ্যা থিয়েটারে ঋত্বিক ঘটক। মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৫১।
২. চক্রবর্তী, রথীন সম্পাদনা। ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৩৯৯।
৩. তদেব, পৃ. ৩৯৯।
৪. তদেব, পৃ. ৪০০।
৫. তদেব, পৃ. ৪০৯।
৬. তদেব, পৃ. ৪২২।
৭. কুমার চ্যাটার্জী, সৌমিত্র সম্পাদনা। নাট্যকথা বিশেষ সংখ্যা থিয়েটারে ঋত্বিক ঘটক। মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৭৭।
৮. তদেব, পৃ. ১৬৮।
৯. চক্রবর্তী, রথীন সম্পাদনা। ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪০৩।
১০. তদেব, পৃ. ৪০৭।
১১. তদেব, পৃ. ৪২২।
১২. তদেব, পৃ. ৩৯৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, পার্থ সম্পাদনা। ঋত্বিককুমার ঘটক কথাবার্তা সংগ্রহ। প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯।
২. ঘটক, সুরমা। ঋত্বিক। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, জুন ২০২৩।

সহায়ক গবেষণা:

১. চক্রবর্তী, নিবেদিতা। ঋত্বিক কুমার ঘটক ও তাঁর নাট্যচর্চা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।